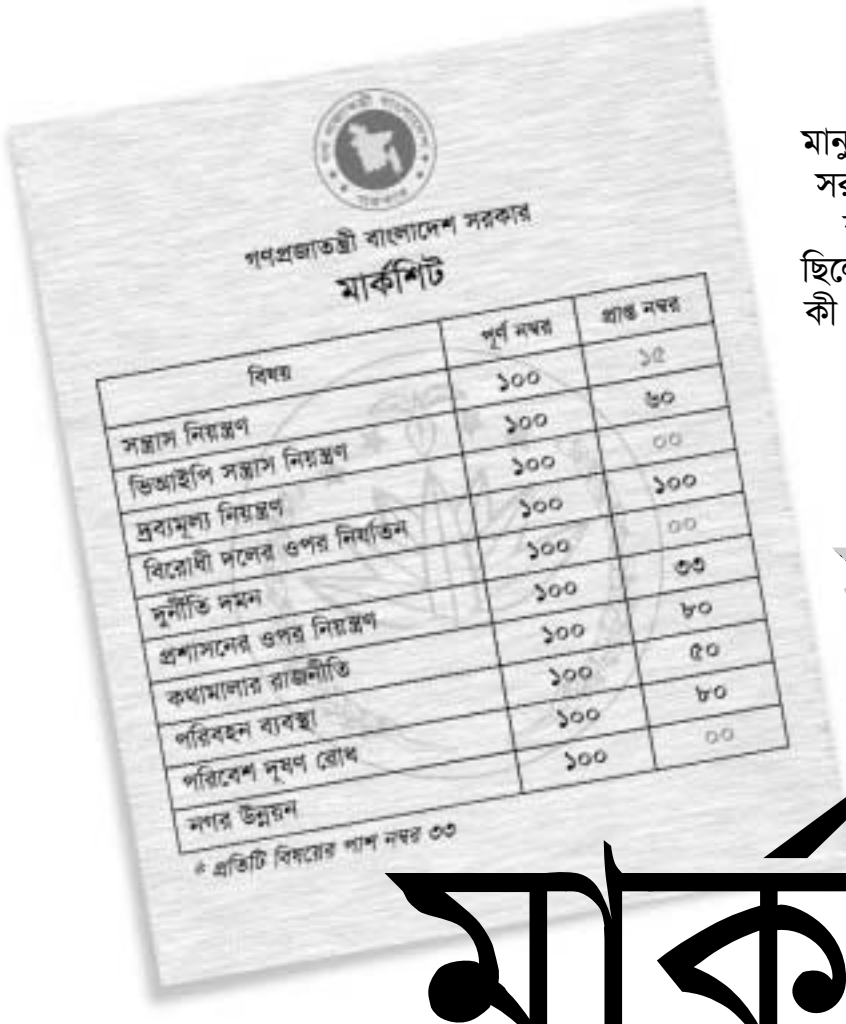
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মার্কশিট

বিষয়	পূর্ণ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ	১০০	১৫
ভিআইপি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ	১০০	৬০
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ	১০০	০০
বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন	১০০	১০০
দুর্নীতি দমন	১০০	০০
প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ	১০০	৩৩
কথামালার রাজনীতি	১০০	৮০
পরিবহন ব্যবস্থা	১০০	৫০
পরিবেশ দূষণ রোধ	১০০	৮০
নগর উন্নয়ন	১০০	০০

* প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৩৩

মানুষ এখন পেছন ফিরে হিসাব করছে সরকারের ৩৬৫ দিনের কার্যক্রম। কী করার কথা ছিলো, কী হওয়ার কথা ছিলো, কী করেছে আর কী হয়েছে...। কী করবে, কী হবে আগামী চার বছর, সেটাও মানুষ ভাবতে চাইছে ...

জোট সরকারের এক বছর
মার্কশিট

গোলাম মোর্তোজা

সাধারণ মানুষ বা জনগণ বলতে যাদেরকে বোঝানো হয়, তারা সহজ এবং সরল। অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র। আত্মবিশ্বাসী না হলেও বিশ্বাসী। তারা ধর্মে বিশ্বাসী, বিশ্বাসী সামাজিক প্রথায় এবং নেতাদের কথায়। তাদের বিশ্বাস এবং দরিদ্র্যতা আসলে দুর্বলতা—এটা নিজেরা না বুঝলেও রাজনীতিবিদরা বোঝে। জনমানুষের এই দুর্বলতার সুযোগ ভালোভাবেই নেয় রাজনৈতিক নেতারা। মিথ্যা বা অর্ধসত্য অথচ আবেগপ্রবণ বক্তব্য, প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন আদায় করে নেয় রাজনীতিক নেতারা। এই ধরনের নেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল গ্রিসের অবক্ষয়ের যুগে। এথেন্স ও গ্রিসের অন্যান্য নগর রাষ্ট্রের অধঃপতন এই নেতারা আরো ত্বরান্বিত করেছিলো। গ্রিকরা এই নেতাদের পরিচিতি দিয়েছিল 'ডেমাগগ' (Demagogue)। এই ডেমাগগ শব্দটি দিয়ে বক্তৃতাসর্বস্ব, গলাবাজ এবং লোক-ক্ষেপানো রাজনীতিবিদদের বোঝানো হতো। সমাজের প্রতি, মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি, যাদের কোনো দায়বদ্ধতা ছিলো না। নিজের স্বার্থটাই ছিলো তাদের কাছে শেষ কথা।

গ্রিক নগররাষ্ট্রের সেই ধারণা পেরিয়ে পৃথিবী এগিয়ে গেছে অনেক অনেক দূর। কিন্তু পৃথিবী থেকে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রটি যেন আলাদা। আমাদের রাজনীতিবিদ, জনগণ যেন এখনো রয়ে গেছে সেই গ্রিসের অবক্ষয়ের যুগেই। এখনো আমাদের জনগণ

হত্যাকারী হিসেবে যাদের নাম আসছে তারাও তো আপনাদের দলের নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী। নিউটন, রাজু, শাহাদতদের পরিচয়ই বা কী? সেটা আপনারা যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যেমন জানেন, জানেন দেশের মানুষও। নিউটন, রাজু, শাহাদতরা শুধু সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসের ধারক এবং বাহক। আর জোট সরকার তাদের আশ্রয়দাতা

রাজনীতিবিদদের অসত্য, অর্ধসত্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে, বিভ্রান্ত হয়। স্বৈরাচার উৎখাত করে জনগণের 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পালা করে দুই দলকে ক্ষমতায় আনছেন জনগণ। প্রতিবারই স্বপ্ন দেখছেন– এইবার তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। '৯১ সালে বিএনপিকে নিয়ে দেখা স্বপ্ন ভুল প্রমাণ হয়েছিল। তাই '৯৬ সালে স্বপ্ন দেখেছিলো আওয়ামী লীগকে নিয়ে। সে স্বপ্ন শুধু ভুল নয়, ছিলো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। ২০০১ সালে আবার বিএনপিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে, দেখতে বাধ্য হয়েছে। আর কোনো বিকল্প ছিলো না। তবে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে এবার জনগণ অনেক বড় স্বপ্ন দেখেছিলো। এই বড় স্বপ্ন বাস্তবায়নের বিশাল দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতায় এখন বিএনপি তথা জোট সরকার। জোট সরকারের এক বছর পূর্ণ হলো ১০ অক্টোবর। মানুষ এখন পেছন ফিরে হিসাব করছে সরকারের ৩৬৫ দিনের কার্যক্রম। কী করার কথা ছিলো, কী হওয়ার কথা ছিলো, কী করেছে আর কী হয়েছে...। কী করবে, কী হবে আগামী চার বছর, সেটাও মানুষ ভাবতে চাইছে। অতীত নিয়ে যেমন মানুষ খুশি হতে পারছে না, খুশি হতে পারছে না আগামী দিনের কথা ভেবেও। হতাশা জাপটে ধরছে। কোন মহামানবের আগমনে এই হতাশার মেঘ কেটে যাবে, জেগে উঠবে উজ্জ্বল আলো– মানুষ তা জানে না। জনমানুষ আগে নয়, ঠকে তারপর বুঝতে পারে ঠকলাম, প্রতারিত হয়ে বুঝতে পারে, প্রতারিত হলাম। তারপরও স্বপ্ন দেখা মানুষের স্বভাব। স্বপ্ন সে দেখেই চলে। রাজনীতিবিদ-আমলার প্রতারণার শিকার হয়েই সে বেঁচে থাকে।

অসত্য এবং আবেগপ্রবণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনমানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে– ক্ষমতায় যারা থাকে তারা কখনো এটা মনে করে না। বর্তমান জোট সরকারও সেটা মনে করছে না। সাপ্তাহিক ২০০০ জোট সরকারের গত এক বছরের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মতামতের ওপর ভিত্তি করে একটি মার্কশিট তৈরি করেছে। বিষয় ১০টি। প্রতিটি বিষয়ের পূর্ণ নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৩৩। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বের দিক দিয়ে বিষয়ের এক নম্বরে স্থান পেয়েছে 'সন্ত্রাস'। সন্ত্রাস বিষয়টিকে আবার আমরা দুইভাগে ভাগ করেছি। এক. সাধারণ সন্ত্রাস দুই. ভিআইপি সন্ত্রাস।

প্রথমেই আসা যাক সাধারণ সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস নির্মূল করতে না পারলেও নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়া বলার কিছু ছিলো না। কারণ বিগত আওয়ামী শাসনামলে সন্ত্রাস সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিলো। মানুষ এর থেকে মুক্তি চাইছিলো যে কোনো কিছুর বিনিময়ে। সেই সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা মানুষ শুনেছিলো খালেদা জিয়ার মুখ থেকে। মূলত এই একটি অঙ্গীকারই বিএনপি'র বিপুল ভোট বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিলো। কিন্তু গত এক বছরের হিসাবে এই প্রধান বিষয়টিতে জোট সরকার পাস করতে পারেনি। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ১০০'র মধ্যে ১৫ নম্বরের বেশি দিতে পারিনি। সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। হত্যাকান্ডের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সমাজে এখন যারা সন্ত্রাস করছে তাদের সবারই পরিচিতি কোনো না কোনোভাবে বিএনপি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস করছে জামায়াত-শিবির। সরকার বলতে চাইছে সব সন্ত্রাসই করছে বিরোধী দল। সব সরকারই ক্ষমতায় থেকে যা বলে, বর্তমান সরকারও তাই বলছে। এখন সরকারের ভাষ্য যদি সত্যি ধরে নিই তাহলে কী প্রমাণ হয়? দেশে সন্ত্রাস অব্যাহত আছে, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে নেই– এটাই প্রমাণ হয়। বিরোধী দল সন্ত্রাস করে সরকারকে বিপদে ফেলতে চাইছে– ধরে নিলাম এটাও সত্যি। প্রশ্ন আসে সরকারে থেকে তাহলে আপনারা করছেনটা কী? সন্ত্রাস যারা করছে তাদের ধরছেন না কেন? আপনাদের দলের কমিশনার বিনয়, নিউটন, রাজু, শাহাদত- চারজন নিহত হলো। রাজু, শাহাদতদের হত্যাকারী কারা? হত্যাকারী হিসেবে যাদের নাম আসছে তারাও তো আপনাদের দলের নেতা-কর্মী-সন্ত্রাসী। নিউটন, রাজু, শাহাদতদের পরিচয়ই বা কী? সেটা আপনারা যারা ক্ষমতায় আছেন তারা যেমন জানেন, জানেন দেশের মানুষও। নিউটন, রাজু, শাহাদতরা শুধু সন্ত্রাসী নয়, সন্ত্রাসের ধারক এবং বাহক। আর জোট সরকার তাদের আশ্রয়দাতা। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করা যাবে, তবে প্রমাণ দেয়া যাবে না। নিউটন, রাজু, শাহাদতরা যে সন্ত্রাসী ছিলো তার অগণিত প্রমাণ দেয়া যাবে। তাদের তৈরি করা সন্ত্রাসীরাই তাদের হত্যা করেছে। সেই হত্যাকারীদের অনেকেই সরকারি দলের নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে টিকে আছে। এটাই সবচেয়ে বড় সত্য।

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারের মানসিকতা যদি বর্তমানের মতো অব্যাহত থাকে, তবে একটা ভয়ঙ্কর আগামীর অপেক্ষায় থাকতে হবে দেশবাসীর। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জোট সরকার যে ১৫ নম্বর পেয়েছে তা শুধুমাত্র তার কিছু উদ্যোগের কারণে পেয়েছে। বিডিআর দিয়ে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা একটা ইতিবাচক দিক। কিন্তু দুঃখজনক পরবর্তীতে অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে এসব উদ্যোগ আর বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ভিআইপি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট ক্লাস মার্ক পেয়েছে জোট সরকার। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৬০। আওয়ামী লীগের তৈরি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণ করে যাওয়া ভিআইপি সন্ত্রাসীদের আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়নি জোট সরকার। হাজী সেলিমের শুন্যস্থান পূরণ করতে পারেনি বিএনপি'র ভিআইপি সন্ত্রাসী। দলীয় হাইকমান্ডের ধমকে কিছুটা ভয়ে আছেন

সাধারণ সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে পাস করতে না পারলেও ভিআইপি সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ফার্স্ট ক্লাস মার্ক পেয়েছে জোট সরকার। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৬০। আওয়ামী লীগের তৈরি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণ করে যাওয়া ভিআইপি সন্ত্রাসীদের আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়নি জোট সরকার। নাসিরউদ্দিন পিন্টু, হাজী সেলিম হয়ে ওঠার আগেই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সরকার। একথা সত্যি যে পিন্টুর সন্ত্রাসী বাহিনী এবং অস্ত্র রয়ে গেছে। তার বাহিনী সন্ত্রাসী কর্মকান্ডও বন্ধ করেনি। লালবাগের একজন বিএনপি'র ওয়ার্ড কমিশনার পিন্টু বাহিনীর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। সেই ওয়ার্ড কমিশনারের নামের আগেও অবশ্য 'সন্ত্রাসী' শব্দটি রয়েছে। নিহত চার ওয়ার্ড কমিশনারের নামের সঙ্গে এই নামটি যোগ হয়ে যেতে পারে যে কোনো সময়। তারপরও বলা যায় হাজী সেলিমের শুন্যস্থান পূরণ করতে পারেনি বিএনপি'র ভিআইপি সন্ত্রাসী। দলীয় হাইকমান্ডের

ধমকে কিছুটা ভয়ে আছেন।

উপমন্ত্রী পচামোল্লা পুত্র বাচ্চু মোল্লা শুরু করেছিলেন দীপু চৌধুরী স্টাইলেই। কিন্তু সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয় না পাওয়ায় সুবিধা করতে পারেননি। নাসিরউদ্দিন পিন্টু এবং বাচ্চু মোল্লা– এই দু'জন গ্রেপ্তার না হলে, আরো অনেক ভিআইপি সন্ত্রাসীর জন্ম নিতো। শুরুতেই ব্যবস্থা নেয়ায় গত এক বছরে সেই অর্থে তেমন কোনো ভিআইপি সন্ত্রাসীর উত্থান হয়নি। এটা জোট সরকারের একটি ভালো দিক।

কিন্তু সরকারের বয়স যত বাড়ছে, ততই পরিবর্তন হচ্ছে কথা এবং কাজে। এখন সব রকম সন্ত্রাসের জন্যে দায়ী করছে বিরোধী দলকে। ভিআইপি সন্ত্রাসীরা এটাকে মনে করছে গ্রিন সিগন্যাল। আওয়ামী লীগের এ ধরনের গ্রিন সিগন্যাল পেয়েই জন্ম হয়েছিলো দীপু চৌধুরীদের। একথা সম্ভবত জোট সরকার ভুলতে বসেছে। সত্যি সত্যি যদি একথা সরকার ভুলে যায় তাহলে আগামী এক বছরে ভিআইপি সন্ত্রাসের অবস্থা কেমন হবে- সেটাই দেখার বিষয়।

বিগত এক বছরে আওয়ামী লীগের ভিআইপি সন্ত্রাসীদের অস্তিত্ব বোঝা যায়নি। তারা কেউ কেউ পালিয়ে গেছে। অনেকে আত্মগোপন করে আছে। সন্ত্রাসী বাহিনীর অনেক সদস্য আবার ইতিমধ্যে সরকারি দলেও ঢুকে গেছে। সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো বিগত ভিআইপি সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি। যে দু'একজনকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের নামেও উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ সংবলিত মামলা দায়ের করতে পারেনি। হাস্যকর ৫৪ ধারা বা গোঁজামিলের মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনিবার্য পরিণতিতে জামিনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে ভিআইপি সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ। এছাড়া এই ভিআইপি সন্ত্রাসীদের বিশাল বাহিনীর সদস্যদেরও গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। উদ্ধার হয়নি তাদের বিশাল ভান্ডারের প্রায় একটি অস্ত্রও। এই অস্ত্রগুলো এখন ব্যবহার হচ্ছে না। কখনোই যে ব্যবহার হবে না, সেটা ভাবা যায় না। সুযোগ বুঝে সন্ত্রাসীরা এই অস্ত্র আবার ব্যবহার করতে চাইবে। এদের অনেকের গায়েই তখন থাকবে সরকারি দলের সিল। তখন বিষয়টিকে সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে- তার ওপরই নির্ভর করবে জোট সরকারের ভবিষ্যৎ।

মানুষের আয় বাড়ে না, বাড়ে ব্যয়। বাজেটে দাম কমলেও বাড়ে, বাড়লেও বাড়ে। এ যেন 'এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারে'র সূত্র। কোনো পরিবর্তন নেই। দেশ চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ গত কয়েক বছর ধরেই। তারপরও চালের দাম বাড়ছেই। যেন এটাই নিয়ম। শুধু চাল নয়, প্রতিটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য।

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই সরকার পদ্ধতির উদ্ভব। একজন ব্যবসায়ী দাম বাড়িয়ে অধিক লাভ করতে চাইলে সেটা অনৈতিক, তবে অস্বাভাবিক নয়। আমাদের জীবনের অভিধান থেকে নৈতিকতা শব্দটি হারিয়ে গেছে অনেক কাল আগে। আমাদের ভেতরে নৈতিকতা বা বিবেক এখন আর কাজ করে না। অসৎ ব্যক্তিদের অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যেই প্রয়োজন আইনের। উদ্যোগী হতে হয় সরকারের। বৃষ্টি, বন্যার অজুহাতে ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল বাড়িয়েছে, নিজেদের খেয়ালখুশি মতো, অন্যায্যভাবে। সরকার এখানে পালন করেছে দর্শকের ভূমিকা। তবে নীরব নয়, সরব। নেতা-কর্মী-মন্ত্রীরা শুধু গলাবাজি করেছে, কাজের কাজ কিছু করেনি। ১৬ টাকার চাল ২২ টাকা হয়েছে, সরকার শুধু একটি মূল্য তালিকা ঝুলিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছে। কাঁচামরিচের কেজি ১২০ টাকা হয়েছে, সরকার বলেছে, এটা সাময়িক। গত এক বছরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের কোনো রকম তৎপরতা ছিল না। এই ক্ষেত্রটিতে সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ১০০-র মধ্যে এই ক্ষেত্রে সরকারের প্রাপ্ত নম্বর জোড়া শূন্য। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেশ ভালো রকমের সফলতার পরিচয় দিয়েছিল। চালের দাম হুটহাট বাড়েনি, বাড়েনি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও। এর পেছনে বিগত সরকারের কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর বিশাল অবদান ছিল। জোট সরকারের কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী প্রায় পুরো সময়টাই ব্যয় করেন নিজের দল গোছানোর কাজে। সরকারের সাপোর্ট নিয়ে মতিউর রহমান নিজামী জামায়াতে ইসলামীর শক্তি বৃদ্ধি করছেন। দ্রব্য উৎপাদন হলো কিনা, কৃষক দ্রব্যের সঠিক মূল্য পেল কিনা, সার-তেলের দাম বাড়লে উৎপাদন কতোটা কম হবে, দাম কতোটা বাড়বে- এসব দেখার মতো সময় মতিউর রহমান নিজামীর নেই। যেটা ছিল মতিয়া চৌধুরীর।

নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে ইতিহাস চিহ্নিত করবে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে। এর দায়ভার কোনোদিন মতিউর রহমান নিজামীরা নেবে না। মতিউর রহমান নিজামীদের জন্যই 'ক্রিম' খাওয়ার জন্যে। পাকিস্তান আমলেও খেয়েছে, এখনও খাচ্ছে। আমাদের রাজনীতিবিদরা এটা কোনোদিনই বুঝলো না।

তবে নিশ্চয়ই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে মতিউর রহমান নিজামীর একার কর্মকান্ড দায়ী নয়। আসলে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের যেকোনো ভূমিকা আছে বা থাকা উচিত- গত এক বছরে সেটাই সম্ভবত সরকার বুঝে উঠতে পারেনি। আগামীতেও বুঝে উঠতে না পারলে পরিণতি শুভ হবে না, দেশের বা বিএনপি'র কারো জন্যই।

নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে ইতিহাস চিহ্নিত করবে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে। এর দায়ভার কোনোদিন মতিউর রহমান নিজামীরা নেবে না। মতিউর রহমান নিজামীদের জন্যই 'ক্রিম' খাওয়ার জন্যে। পাকিস্তান আমলেও খেয়েছে, এখনও খাচ্ছে। আমাদের রাজনীতিবিদরা এটা কোনোদিনই বুঝলো না

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করেনি, চেষ্টাও করেনি। তবে নিয়ন্ত্রণ নয়, দমন করেছিল বিরোধী দলকে। নির্যাতন করে যে বিরোধী দলকে দমন করা যায় সেই পথটি দেখিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ। এই ক্ষেত্রটিতে আওয়ামী লীগ অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে জোট সরকার। দক্ষতার মাপকাঠিতে গত এক বছরে তারা সম্ভবত আওয়ামী লীগের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। বিরোধী দল নির্যাতনের ক্ষেত্রে জোট সরকার ১০০-র মধ্যে ১০০-ই পেয়েছে। যদিও এখানে তারা আরো বেশি নম্বর পাওয়ার দাবিদার।

আওয়ামী লীগের কৌশল ছিল বিরোধী দলকে রাস্তায় নামতে দেয়া হবে না। বিএনপি নেতা-কর্মীরা রাস্তায় নামলে পুলিশ

দিয়ে বেদম পেটানো হয়েছে। পরবর্তীতে বিএনপি নেতা-কর্মীদের আর রাস্তায় দেখা যায়নি। বিএনপি'র একমাত্র নেতা সাদেক হোসেন খোকা কখনো রাস্তা ছাড়েননি। পুলিশের পিটুনি খেয়েছেন নিয়মিত। এ কারণে সেই সময় একটি দৈনিক পত্রিকা শিরোনাম দিয়েছিল, 'আজ হরতাল, খোকাকে পুলিশ পেটাবে'।

জোট সরকার আওয়ামী লীগকে মাঠে নামার কোনো সুযোগই দিতে চায়নি গত এক বছরে। হরতাল, আন্দোলন কর্মসূচিতে প্রথমদিকে মতিয়া চৌধুরীর সঙ্গে মোহাম্মদ নাসিমসহ আরো দু'একজন নেতাকে রাস্তায় দেখা যেত। একদিনের পুলিশের পিটুনির পর নাসিমসহ অন্যদের আর রাস্তায় দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগের খোকার ভূমিকায় রয়েছেন মতিয়া চৌধুরী।

আওয়ামী শাসনামলে বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, ফেনী, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর চালানো হয়েছে বর্বর নির্যাতন। ফলে তারা এলাকায় থাকতে পারেনি। বিএনপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাগুলো থেকে পালিয়েছে আওয়ামী নেতা-কর্মী-ক্যাডাররা। এসব শূন্যস্থান পূরণ করেছে বিএনপি নেতা-কর্মী-ক্যাডাররা। এক বছর শেষে কোনো কোনো অঞ্চলে আওয়ামী লীগ ফেরার চেষ্টা করছে। এ উদ্দেশ্যেই বরিশাল, ভোলা, লক্ষ্মীপুর সফর করছে বিরোধীদলীয় উপনেতা। বরিশালের বিএনপি সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সারোয়ারের কর্মী-ক্যাডাররা ভালোমতোই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাকে। প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে সশস্ত্র ক্যাডাররা মহড়া দিয়েছে। আওয়ামী নেতা-কর্মীদের নির্যাতন করেছে। সাংসদ সারোয়ার যদিও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন প্রশাসনকে। তবে এটা যে কতো বড় রাজনৈতিক বক্তব্য সেটা এখন জনগণ বুঝতে শিখেছে। আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ বরিশালকে সন্ত্রাসীদের ক্যান্টনমেন্টে রূপ দিয়েছিলেন। বিএনপি আমলে প্রতিপক্ষ না থাকায় সেই ক্যান্টনমেন্টের অবস্থাটা এতোদিন জনসম্মুখে আসেনি। আওয়ামী লীগ ফিরতে চাওয়ায় বোঝা গেল বরিশালে এখনো সন্ত্রাসীদের ক্যান্টনমেন্ট আছে। বদল হয়েছে শুধু পরিচয়।

সরকারের শেল্টার নিয়ে নাজিউর রহমান মঞ্জুরও বিরোধীদলীয় উপনেতাকে ভালোই অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ভোলায়। মঞ্জুর ভোলাকে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে রূপ দেয়ার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে লক্ষ্মীপুরের বিএনপি। প্রশংসা করতেই হবে লক্ষ্মীপুর সদরের এমপি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানিকে। তিনি বিরোধী দলের ওপর কোনো রকম নির্যাতন চালাতে দেননি তার নেতা-কর্মীদের। এটাই যদি সারা দেশের চিত্র হতো, তাহলে সত্যি বদলে যেত বাংলাদেশ।

সারা দেশে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারি দলের নেতা-কর্মী-ক্যাডাররা নির্যাতন করছে। সঙ্গে প্রশাসন তো রয়েছেই। লক্ষ্মীপুরে ঘটেছে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। সারা দেশের চিত্রের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। বিষয়টি সরল সমীকরণের মতো। আওয়ামী লীগ নির্যাতন করেছিল, তাই বিএনপিও করছে। আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে হয়তো বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন আরো বাড়বে। উদ্ভাবিত হবে আরো নতুন নতুন নির্যাতনের কৌশল।

সন্ত্রাসের মতো দুর্নীতির বিরুদ্ধেও বিরোধীদলের বিএনপি জেহাদ ঘোষণা করেছিলো। দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিএনপি কথা বলেছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়। বিশ্বাসযোগ্য করে বলার কৃতিত্ব দেখিয়েছিল বিএনপি। ক্ষমতা নেয়ার সময় খালেদা জিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন, 'দুর্নীতি করলে কাউকে রেহাই দেয়া হবে না। মনে রাখতে হবে, মন্ত্রিত্ব কোনো স্থায়ী চাকরি নয়।' কিন্তু ক্ষমতার এক বছরে কথার সঙ্গে কাজের মিল পাওয়া যায়নি। নৌ পরিবহনমন্ত্রী কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির এতো বড় অভিযোগ ওঠার পরেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিশাল অঙ্কের অর্থ ফেরত নিয়ে গেছে ড্যানিডা। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দুর্নীতি পেয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর যাই হোক সদিচ্ছা নেই। দুর্নীতি দমন বিষয়ে জোট সরকার ১০০-র মধ্যে পেয়েছে জোড়া শূন্য।

ক্ষমতা থেকে যাওয়ার পর রাজনীতিবিদ-মন্ত্রীদের নামে মামলা হয়। বিষয়টি কালচারে পরিণত হয়েছে। দুর্বল এবং তথ্য প্রমাণ ছাড়া সাজানো মামলায় কারো শাস্তি হয় না। এই কালচাল থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি। বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় বিএনপি একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণমুক্ত দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়েছিল। অবশ্য ক্ষমতায় এসে সে কথা ভুলে যেতে সময় নেয়নি। ন্যায়পাল নিয়োগের প্রতিশ্রুতির কথাও সম্ভবত এখন আর বিএনপি'র মনে নেই। বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসনের কথা তো আর বলেই না।

বিএনপি দলের একজন সংসদ সদস্যই চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ করেছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের বিরুদ্ধে। অভিযোগটি সত্যি না মিথ্যা সেটার তদন্ত পর্যন্ত করেনি জোট সরকার। গম কেলেঙ্কারির নায়ক বিএনপি'র নেতা-সাংসদ-মন্ত্রী কারো বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়নি জোট সরকার। এমনকি তদন্ত রিপোর্টও প্রকাশ করেনি।

বিগত সরকারের এবং বর্তমানে সরকারের দু-আড়াই মাসের কর্মকান্ডের ফলাফল আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি। অক্ষুণ্ন রেখেছি দুর্নীতিতে প্রথম স্থান। আমাদের হ্যাটট্রিক শিরোপা কেউ ঠেকাতে পারবে না। সিটি কর্পোরেশনে আগেও যেভাবে কয়েকশ' কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে, এখনো সেভাবেই হচ্ছে। একদা রাস্তার নেতা সাদেক হোসেন খোকা মেয়র হয়েছেন। কিন্তু ২০০০-এ প্রকাশিত শত শত কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধেও তেমন কোনো ব্যবস্থা নেননি। ব্যবস্থা নেয়ার কোনো উদ্যোগের কথা আমরা এখনো জানি না। জানি দুর্নীতি চলছেই। আওয়ামী আমলের দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে নাম আসে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের। বিএনপি আমলের দুর্নীতির দায়ভার কী খোকাকে নিতে হবে না?

নিয়ন্ত্রণ নয়, দমন করেছিল বিরোধী দলকে। এই ক্ষেত্রটিতে আওয়ামী লীগ অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে জোট সরকার। দক্ষতার মাপকাঠিতে গত এক বছরে তারা সম্ভবত আওয়ামী লীগের চেয়েও এগিয়ে রয়েছে। বিরোধী দল নির্যাতনের ক্ষেত্রে জোট সরকার ১০০-র মধ্যে ১০০-ই পেয়েছে। যদিও এখানে তারা আরো বেশি নম্বর পাওয়ার দাবিদার

কোনো সরকারই প্রশাসনের ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, মূলত নিজেদের অযোগ্যতার কারণে। '৯১-এর খালেদা জিয়া সরকারকে এর জন্যে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলো। প্রমাণ হয়েছিল প্রশাসনের ওপর বিএনপি'র কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। এবার বিএনপি শুরু থেকেই সে বিষয়ে সচেতন। ক্ষমতায় এসেই জনতার মঞ্চের সঙ্গে সম্পৃক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেরি করেনি। অবসর-ওএসডি-বদলি, নানা রকমের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অভিযুক্ত আমলাদের বিরুদ্ধে। একারণে প্রশাসনের অনেকেই বিএনপির ওপর ক্ষুব্ধ। তবে সেটা প্রকাশ করার সুযোগ এখানো পায়নি। একেবারেই যে প্রকাশ হচ্ছে না তা অবশ্য নয়। শিক্ষা সচিব ইতিমধ্যে মন্ত্রীদের তোয়াক্কা না করার নীতি অনুসরণ করছেন। প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে সেই সূত্রে তার বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। তারপরও এক বছরের হিসাবে প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কোনো রকমে পাস করে গেছে জোট সরকার। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৩৩। আগামীতে ভালো প্রস্তুতি না থাকলে এ বিষয়ে ফেল করে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছে দুর্নীতি দমন বা নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর যাই হোক সদিচ্ছা নেই। দুর্নীতি দমন বিষয়ে জোট সরকার ১০০-র মধ্যে পেয়েছে জোড়া শূন্য। বিএনপি দলের একজন সংসদ সদস্যই চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ করেছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের বিরুদ্ধে। অভিযোগটি সত্যি না মিথ্যা সেটার তদন্ত পর্যন্ত করেনি জোট সরকার

জোট সরকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাদের পছন্দের লোকদের বসিয়েছে। এটাকেই বলা হচ্ছে দলীয়করণ। অভিযোগ আছে দলীয়করণের ফলে প্রশাসন স্বাধীন মতো কাজ করতে পারছে না। আসলে প্রশাসন স্বাধীন মতো কাজ করলেই যে, ভালো কাজ করতো সেটা বলা যায় না। একজন রাজনীতিবিদ যত খারাপই হোক না কেন, তিনি অবশ্যই একজন আমলার চেয়ে অন্তত ভালো। কিন্তু সমাজে পরিচিতি পায় পুরোপুরি উল্টোভাবে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে তার পছন্দের লোকদের নিয়ে কাজ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অনেক দেশেই এমনটা হয়। অন্য দেশের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যটা হলো তারা সৎভাবে কাজ করতে চায়, আমরা চাই না। আমরা শুধু অসৎ পথ খুঁজি, ফাঁকি দিতে চাই। তাই যার যেখানে যাওয়ার কথা নয়, সে সেখানে চলে যায়।

জোট সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাদের নিয়োগ দিয়েছে তার বড় একটি অংশ রয়েছে জামায়াত সমর্থিত। জামায়াত সমর্থিত প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিপদের সময় বিএনপির পাশে, কতটা থাকবে, কীভাবে থাকবে– সেটা একটি বড় প্রশ্ন।

কথা বলায় আমাদের রাজনীতিবিদদের জুড়ি নেই। অন্য যোগ্যতায় ধারে কাছে যেতে না পারলেও কথা দিয়ে আমাদের রাজনীতিবিদরা পৃথিবীর যে কোনো রাজনীতিবিদদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই সুলিখিত এবং সুপঠিত বক্তব্য রেখে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। যার ফলে এবিষয়ে পেয়ে গেছেন লেটার মার্কস। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৮০।

যেমন ছিল অর্থনীতি

এবারের সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন সাইফুর রহমানের ওপর অনেকেই ভরসা রেখেছিলেন। দেশের অর্থমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে বোঝেন, ১৯৯১ সালেও বুঝেছেন। এমন ইমেজ ছিল সাইফুর রহমানের। গত সরকারের আমলে কিবরিয়ার উল্টোপাল্টা কথায় অনেকে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই সাধারণ মানুষ স্বস্তি খুঁজেছিল। দেশের অর্থমন্ত্রীর কাছে তাদের চাওয়ার খুব বেশি কিছু ছিল না। দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আর আয় বৃদ্ধি। দেশের মানুষকে খুশি রাখলে পরের নির্বাচনে জিতে আসা সহজ হবে। এই সহজ জয়ে মূল ভূমিকা রাখেন দেশের অর্থমন্ত্রী। অথচ সাইফুর রহমান যেমন করে যাচ্ছেন তাতে দেশের মানুষের খুশি হবার একটি কারণও নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পতা রয়েই যাচ্ছে, সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্যাক্স। ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের পক্ষে সাধারণ মানের খাদ্য ভাত-মাছ-মাংস জোগাড় করাটাই দুরূহ হয়ে পড়ছে। উৎপাদনে উৎসাহী করার মতো কোনো প্রকল্প সরকার হাতে নিচ্ছে না। অভ্যন্তরীণ বাজারের মতো আন্তর্জাতিক বাজারেও সরকার বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। গার্মেন্টস শিল্পের অবনতি হবে, এ কথা সাধারণ মানুষ সবাই জানতো। সে বিষয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সরকারের মনে রাখা উচিত, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কাপড়ের বাজার নেই, অন্যান্য দেশেও আছে। আর কাপড় মানে শুধু শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, সোয়েটার নয়। অন্যান্য পোশাকও তৈরি করা সম্ভব। এগুলো না দেখে অন্ধের মতো সরকার কেবল আমেরিকার পেছনেই ঘুরছে। ভারতের সঙ্গে যে বৈদেশিক চুক্তি করছে তাতে খুব লাভ হবে বলে মনে হয় না। ভারতের দেয়া তালিকার বেশির ভাগ পণ্য আমাদের এখানে তৈরি হয় না। সুতরাং উৎপাদন স্থায়ীভাবে বাড়ছে না। বৈদেশিক মুদ্রা হয়তো সাময়িকভাবে বাড়বে। কিন্তু তাতে দেশের খুব বেশি লাভ হবে না।

শুধু অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে বিএনপি থামেনি। তারা ব্যাংকে মানুষের সঞ্চয়ের ওপর সুদের হার কমিয়েছে। সঞ্চয়ী হিসাবেও কমেছে সুদের হার। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অনেকে। সরকারের এই সুদের হার কমানোর মূল কারণ ছিল মানুষকে শেয়ার বাজারের প্রতি উৎসাহী করা। এজন্য সরকার শেয়ার বাজারে নতুন নিয়ম, বিভিন্ন বিভাগে ভাগও করেছে। অথচ মানুষ শেয়ার বাজারে যায়নি। কারণ সরকার এখনও আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সাধারণ মানুষ এখনও বিশ্বাস করে শেয়ার বাজার স্বচ্ছ নয়। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান দেখা গেছে, যেগুলোর শেয়ার মূল্য আওয়ামী লীগের আমলে ১৯৯৭ সালের পর ধারাবাহিকভাবে কম ছিল। অথচ বিএনপি আমলে সেগুলোর দাম রাতারাতি বেড়েছে। আবার কোনো

সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া ভ্রাতৃত্ববোধ খালেদা জিয়া ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেয়ার স্বপ্নের বাণী শুনিয়েছেন দেশবাসীকে। তার বক্তব্যে কখনো কাউকে অপমান করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। বিশেষ করে শেখ হাসিনার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে খালেদা জিয়া এগিয়ে থেকেছেন অনেকটা। তার গত এক বছরের প্রায় প্রতিটি বক্তৃতাই ছিলো চমৎকার। তাই এ বিষয়ে লেটার মার্কস পেতে কষ্ট হয়নি একটুও। কিন্তু বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পায়নি মানুষ। তাই কথামালার রাজনীতির লেটার মার্কস জোট সরকারের জন্যে পজিটিভ নয়, নেগেটিভ।

তবে ক্ষমতায় থাকলে যা হয় খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। ইদানীং তার বক্তৃতায় পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার মধ্যে তিনি অন্য রকম গন্ধ পাচ্ছেন। তার বক্তৃতা চলে যাচ্ছে সন্ত্রাসীদের পক্ষে। এটা তিনি বুঝে করছেন, নাকি না বুঝে করছেন- সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। অথবা ক্ষমতায় থাকলে এটাই নিয়ম! যা কিছুই ঘটুক দায় বিরোধী দলের!

বছরের শেষ সময়ে এসে খালেদা জিয়ার বক্তব্যে যে পরিবর্তন আসছে– তা আগামী দিনের বিএনপির জন্যে আতঙ্কজনক। খালেদা জিয়ার চেয়েও আগামী দিনের বিএনপির জন্যে আতঙ্কজনক বক্তব্য বেশি রাখছেন সাইফুর রহমান। তার বক্তব্য রীতিমতো ভারসাম্যহীন।

ক্ষমতায় এসেই পরিবহন ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন এনেছে জোট সরকার। বিশ বছরের পুরনো বাস বন্ধ করে দেয়া ছিলো প্রথম ভালো পদক্ষেপ। অনেক পুরনো বাস আবার রাস্তায় নেমে এলেও মোটামুটি সফল হয়েছিল এই উদ্যোগটি। বেবিট্যাক্সি বন্ধ করার সিদ্ধান্তটি ছিলো অসাধারণ। পুরনো বাস এবং বেবিট্যাক্সি বন্ধ করায় ঢাকার যানজট অনেক কমে গেছে। নগরবাসীর জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু এই চমৎকার পদক্ষেপের পুরো সুফল ভোগ করতে পারছে না সরকার। কারণ বাস-বেবিট্যাক্সি তুলে দেয়া হয়েছে, কিন্তু বিকল্প পরিবহন সঠিক সময়ে রাস্তায় আনতে পারেনি। যোগাযোগমন্ত্রী মুখে অনেক কথা বললেও রাস্তায় পর্যাপ্ত নতুন বাস-ট্যাক্সি নামানো হয়নি। ফলে জনগণ হয়েছে চরম দুর্ভোগের শিকার। নাজমুল হুদা অনেক কিছু করতে চাইছেন। প্রতিদিনই সাংবাদিকদের কাছে নতুন নতুন পরিকল্পনার কথা বলছেন। যার মধ্যে অনেকগুলো অবাস্তব।

পরিবহন ব্যবস্থায় জোট সরকার পাস করে গেছে ভালোমতোই। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৫০। খুব দ্রুত নতুন বাস-ক্যাব-বেবিট্যাক্সি রাস্তায় নামাতে পারলে নম্বর আরো অনেক বেড়ে যাবে। জোট সরকারের এক বছরের সবচেয়ে বড় সাফল্য নগরের পরিবেশ দূষণ রোধ। পলিথিন দানব বন্ধ সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারাটা বিশাল বড় সাফল্যের প্রমাণ। এ বিষয়ে লেটার মার্কস পেতে কোনো সমস্যা হয়নি

তারপরও পরিবহন ব্যবস্থায় জোট সরকার পাস করে গেছে ভালোমতোই। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৫০। খুব দ্রুত নতুন

কোনো শেয়ারের বেলায় ঘটেছে ঠিক উল্টোটি। শেয়ার তো আর সরকারের মন্ত্রী না, যে বিএনপির সময় তাদেরগুলো বাড়বে, অন্য সময় অন্যটি। সরকার থেকে অবশ্য বলা হতে পারে যে, অমুক ব্যবসায় সুবিধা দিয়েছি তাই তমুক ব্যবসা ভালো হয়েছে। এজন্য শেয়ারের দাম বেড়েছে। এ কথা গাধা বিশ্বাস করবে। সাধারণ মানুষ গাধা নয়, বোকা হতে পারে। তাই তারা বোঝে ক্ষমতার হাত বদলে যেসব শেয়ারের দাম বাড়ে-কমে, সেখানে আছে কালো টাকার উপস্থিতি। সাধারণ মানুষ বারবার হাজার টাকা জমাতে পারে না। মন্ত্রী-আমলারা পারেন। তাই শেয়ার বাজারে সাধারণ মানুষের ভরসা নেই। মন্ত্রীর-আমলাদের আছে। যতদিন শেয়ার বাজারের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের সুরাহা না হবে, ততোদিন মানুষ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবে না। সুদের হার কমিয়ে ১%-এর নিচে নামালেও তারা ব্যাংকে টাকা রাখবে।

বিএনপি অবশ্য হুন্ডি ব্যবসায়ী ধরার জন্য প্রশংসা পাবেন, তবে এটাও ধরা পড়তো না ব্যবসার অবস্থা খারাপ না হলে। অনেকে অবশ্য তাদের পয়েন্ট দেবেন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণে। তবে এক্ষেত্রে বিএনপি'র হয়তো অবদান কিছুটা আছে। বিভিন্ন ব্যাংকে সুযোগ-সুবিধা দেয়ায়, কিছু নিয়ম শিথিল করায় রিজার্ভ কিছুটা বেড়েছে। তবে আসল রহস্য হলো বহু ছাত্র, ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী এবং চিকিৎসার্থীর বাইরে যেতে না পারা। এরা যেতে পারলে রিজার্ভ কমতো। এটা সত্যি রেমিটেন্স বেড়েছে। তবে সেটাও হয়েছে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তাদের বকেয়া চুক্তি এখন পাওয়াতে। সরকার নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি করলে ডাউন পেমেন্ট দিতে হতো। যেটা শেষদিকে আওয়ামী লীগকে দিতে হয়েছিল। যার ফলে তখন রিজার্ভ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। পরপর এমন কিছু চুক্তি করলে আবারও বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা একরমকই হবে। একটি ক্ষেত্রে বিএনপি প্রশংসা পাবে। সেটা হলো যুদ্ধবিমান ক্রয় না করার সিদ্ধান্ত। যেখানে আমাদের সামরিক শক্তির প্রয়োজন নেই, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে আমরা পারব না। সেখানে খামোখা রদ্দিমার্কা মিগ-২৯ কেনাটা হতো আত্মহত্যা। ঐ একটি ক্ষেত্রেই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে বিএনপি।

প্লেন না কিনলেও সিএনজি চালিত গাড়ি কেনায় সরকারের ব্যাপক উৎসাহ। অথচ সেই সিএনজি সরবরাহের মতো কাঠামো নেই। সেই কাঠামো তৈরিতে উৎসাহও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দিচ্ছে না সরকার। মানুষকে উৎসাহ না দিলেও সরকারের একটি ব্যাপারে দারুণ উৎসাহ। সেটা করারোপ করা। ব্যাপারটা যেন অন্ধকারে ঢিল মারার মতো। যা ইচ্ছে তাতেই কর বসিয়ে দিচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী। এর প্রমাণ তো দুধের ওপর করের ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। না হলে কি দুধ আর সিগারেটে সমান কর বসে! হয়তো বা অর্থমন্ত্রী ভেবেছিলেন, এই যাত্রা রক্ষা পাবেন। অবশ্য যেভাবে তিনি ডানে-বাঁয়ে কর বসাচ্ছেন তাতে যে খেয়াল করেই দুধ-সিগারেটকে এক কাতারে ফেলেছেন তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আর বসালেই বা কি? এ দেশে ক্ষমতায় বসলে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করা তো অন্যায়। চিন্তা করে কাজ করলে কি আর সব দেশের কোনো সরকার এমন বাজে কাজ করে?

নাসিম আহমেদ

বাস-ক্যাব-বেবিট্যাক্সি রাস্তায় নামাতে পারলে নম্বর আরো অনেক বেড়ে যাবে। পর্যাপ্ত দ্রুত পরিবহন নামাতে পারলে রিকশা এমনিতেই কমে যাবে। রিকশা ধরে ভেঙে চুরমার করে দেয়ার প্রয়োজন পড়বে না। অবৈধ রিকশা ধরা যেতে পারে। তবে ভাঙার প্রয়োজন নেই। এগুলো মফস্বল শহরে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। উদ্যোগ নিলে এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর সাহায্য পেতে পারে সরকার।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময় থেকে ঢাকার রাস্তাঘাটের ভগ্নদশা শুরু হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর তার সামান্য পরিবর্তনও হয়নি। এখন ঢাকার প্রায় প্রতিটি রাস্তাই ভঙ্গুর। সামান্য বৃষ্টি হলেই পুকুরে পরিণত হয় রাস্তাগুলো। অবশ্য সাদেক হোসেন খোকা মেয়র হিসেবে যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন বৃষ্টির মৌসুম। এ কারণে হয়ত তিনি অনেক কিছু করতে পারেননি। তবে যতটুকু করতে পারতেন ততটুকুও করেননি। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন সাতদিনের মধ্যে ঢাকার রাস্তা ঠিক করে ফেলবেন। কিন্তু ঢাকার সব রাস্তা তো দূরে থাক কোনো রাস্তাই ঠিক হয়নি।

নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরের কর্মকান্ডে জোট সরকার পাস করতে পারেনি। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে জোড়া শূন্য। ডেঙ্গু নিধনেও তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। দীর্ঘসময় মশা মারার ওষুধই ছিলো না সিটি কর্পোরেশনের। এ দায় বিগত মেয়রের ওপর পড়ে। তবে জোট সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা সিটি কর্পোরেশন রাস্তায় নেমেছে ডেঙ্গু ভয়ঙ্কর আকার নেয়ার পর। এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ ছিলো প্রশংসনীয়। আসলে ডেঙ্গু বিষয়ে আগে থেকে সরকারের কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না।

জোট সরকারের এক বছর পূর্তিতে মার্কশিট তৈরির জন্য আমরা এই দশটি বিষয়কেই বেছে নিয়েছি। সাধারণ মানুষ যেসব বিষয়ে বেশি সম্পৃক্ত সেগুলোকেই বিবেচনায় আনা হয়েছে।

তবে একটি বিষয় বিবেচনায় আনা হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে বিরোধী দলও সরকারের একটি অংশ। অথচ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ডে এই বাক্যটি এখন হাস্যকর পর্যায়ে চলে গেছে। এ কারণে সরকারের মার্কশিট তৈরির পাশাপাশি বিরোধী দলের নম্বরপত্র করা হলো না এবার। যদি করা হতো সেক্ষেত্রে চিত্রটি বিরোধী দলের জন্যও সুখকর হতো না।

দু'টি রাজনৈতিক দলের কাছেই অনুরোধ, আপনারা আপনাদের নিজেদের মূল্যায়ন করুন। বিশ্লেষণ করুন নিজেদের বক্তৃতা, সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবের কার্যক্রমকে। তৈরি করুন নিজেদের মার্কশিট। কয়েকজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বোঝার চেষ্টা করেন নিজেদের অবস্থা। এই উপলব্ধি যেদিন আপনাদের মধ্যে আসবে সেদিন হয়তো জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোবে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে বিরোধী দলও সরকারের একটি অংশ। অথচ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ডে এই বাক্যটি এখন হাস্যকর পর্যায়ে চলে গেছে। এ কারণে সরকারের মার্কশিট তৈরির পাশাপাশি বিরোধী দলের নম্বরপত্র করা হলো না এবার। যদি করা হতো সেক্ষেত্রে চিত্রটি বিরোধী দলের জন্যও সুখকর হতো না

* * *

লেখাটি লিখতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে এক বছর বা ছয় মাস আগে যে বিষয়ে লিখেছি তার অনেকটাই পুনরাবৃত্তি।

বিষয়টা আমার সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা কী না— তা নিয়ে ভেবেছি। কয়েকজনের সঙ্গে কথাও বলেছি। বুঝলাম সমস্যা আমার একার নয়, সমস্যা সবার। আমরা একটি বৃত্তে আটকা পড়েছি। সীমান্ত রেখা ভাঙার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু বিচরণ সেই বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এই বৃত্ত ভাঙতে হবে, নাহলে পুনরাবৃত্তি হয়তো চলতেই থাকবে।

পরিবহন সেক্টরে সরকার যে সাফল্য পেয়েছে সেটা ধরে রাখতে হলে অবাস্তব পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। বুলেট ট্রেনের চেয়ে বাস-ট্যাক্সি-বেবিট্যাক্সি রাস্তায় নামানোটা জরুরি।

জোট সরকারের এক বছরের সবচেয়ে বড় সাফল্য নগরের পরিবেশ দূষণ রোধ। পলিথিন দানব বন্ধ সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারাটা বিশাল বড় সাফল্যের প্রমাণ। এ বিষয়ে লেটার মার্কস পেতে কোনো সমস্যা হয়নি। ১০০'র মধ্যে পেয়েছে ৮০। বেবিট্যাক্সি বন্ধের কারণেও ঢাকার পরিবেশের উন্নতি হয়েছে।

তবে সারা দেশের পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে, পরিবেশের ভারসাম্য টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজন বনজসম্পদ সংরক্ষণ। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের বনজ সম্পদ শুধু ধ্বংসই করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম, সুন্দরবন, মধুপুরসহ প্রায় প্রতিটি বন বিগত আওয়ামী সরকারের সময়ে নির্বিচারে ধ্বংস করা হয়েছে। সেই ধ্বংসের প্রক্রিয়া বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে।

সত্যিকারের পরিবেশ উন্নয়নের জন্যে বনজসম্পদ ধ্বংস রোধ করা প্রয়োজন। সরকার আন্তরিক হলে এটা অসম্ভব নয়। পলিথিন বন্ধের সিদ্ধান্ত তার প্রমাণ। এ বিষয়ে বিএনপি সরকারের আরো বেশি নম্বর পাওয়ার সুযোগ আছে।

মেগা পুরস্কার রয়েছে এ পর্বেই

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০

কুইজ প্রতিযোগিতা

শুরু হলো দ্বিতীয় পর্ব

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১ ইঞ্চি কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পাম টপসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায়